জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

মুজিববর্ষ ১৭ মার্চ ২০২০ - ২৬ মার্চ ২০২১ বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

আমাদের সামনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী একটি ভিন্ন তাৎপর্য এবং গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে। তা হচ্ছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সহযোগী ছিলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীন করেছেন এবং সর্বোপরি যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। অর্থাৎ এবারই তাঁদেরকে পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে তাঁদেরকে আর পাওয়া যাবে না। এদিক থেকে এবারের জন্মবার্ষিকী বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। এজন্য নানা কর্মসূচির মধ্যে ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর কিছু লিখিতভাবে আছে। কিছু বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে এবং অজানাও রয়েছে নানা ঘটনা। সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টির দরকার, তা হচ্ছে পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। সামন্তবাদী, আধা-সামন্তবাদী, কৃষিনির্ভর এবং জোতদার ও জমিদারের আওতাভুক্ত একটি জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র তৈরি করে দিলেন বঙ্গবন্ধু। আর এ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা নানাভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সহযোগী ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিচারণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। যেগুলো দিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। এসব কাজ করার সুযোগ এবারই রয়েছে। এক সময় তাঁরা আমাদের মাঝ থেকে চলে যাবেন। কারণ এখন অনেকেরই বয়স পঞ্চাশ এবং ষাটের উর্ধ্বে। বিশ্ব রাজনীতিতে নেলসন ম্যান্ডেলা, মাও সেতুং, মার্টিন লুথার কিং, মহাত্মা গান্ধীদের মতো নন্দিত নেতাদের অবদান মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই পর্যায়ের নেতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনেক বিশ্ব নেতাদের চেয়ে বেশি।

আমরা এখন গণতন্ত্র, সাম্য, শোষণহীন সমাজের কথা বলি। বিষয়গুলোর আবেদন শাশ্বত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শন ছিল ভিন্নতর। তিনি সাম্যের নতুন ধারণা দিয়েছেন, গণতন্ত্রেরও সংজ্ঞা দিয়েছেন। অব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকার', যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ানো হয় তা থেকে ভিন্ন। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন ৭ মার্চের ভাষণে। তিনি উল্লেখ করেছেন, "যদি একজনও সঠিক কথা বলে, আমরা সংখ্যায় যাই হই না কেন, তা মেনে নিব।" লিংকনের গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। বেশির ভাগ লোক যা বলবে সেটাই গণতন্ত্র। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন, বেশির ভাগ যা বলেন সেটা গণতন্ত্র নয় এমনকি সবাই মিলে যা বলে সেটাও গণতন্ত্র নয়। তিনি 'ন্যায্যতার' উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর এরকম অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। যা একেবারে ইউনিক। বিশ্ব নেতৃত্বের পর্যায়ে যেতে যে ধরনের কথা, বক্তব্য, অনুশাসন, বাচনভঙ্গি থেকে শুরু করে শব্দ চয়ন, সবকিছু মিলিয়ে সত্যিকারের ওই স্তরের বিশ্ব নেতার জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি আমরা। এইবারই এ উৎসব পালনের সুযোগ আমরা প্রথম পেয়েছি। কারণ এটা আর কখনো আসবে না। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর এ জন্মশতবার্ষিকীকে বিশ্ব পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ আমরা বিশ্বের বুকে সফল বাঙালি জাতি। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছি। এক সময় আমরা মধ্যম আয় থেকে ধনীদেশে পরিণত হবো। কিন্তু আমাদের শুরুটা হয়েছিল কীভাবে? দেশ কীভাবে এই পর্যায়ে এলো? এগুলোর পুরোটাই বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হলে বঙ্গবন্ধুর জীবন আলেখ্য সবার আগে জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকে জানার বড় সুযোগ। আমরা যে যেখানে থাকি না কেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে সবাই মিলে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করছি। এজন্য ডকুমেন্টেশনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে এ দিবসটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অগ্রণী। কারণ আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল পর্যায়ে পড়ছে তাদের মনোজগতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসতে হবে। একটি সময় তরুণদের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে মুছে ফেলার নানা মিথ্যা তত্ত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ঘটনাও ঘটেছে। কাজেই সেখান থেকে তরুণ প্রজন্মকে বের করে নিয়ে আসার জন্য তাদের কাছে অধিক তথ্য সরবরাহ করা দরকার।

এবার আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ দিবসটি পালনে নানা কর্মসূচির কথা চিন্তা করা হয়েছে। আমাদের প্রধান কাজ হলো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উচ্চ এবং বিশ্বমানের প্রকাশনা করা। ইতোমধ্যে লেখা সংগ্রহের কাজ এগিয়ে চলছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী যাঁরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভাবেন, ভালো লিখতে পারেন, তাঁদের লেখা নিয়ে মানসম্পন্ন একটি সংকলন তৈরি করা হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর উপর মাসব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও নাট্যকলা বিভাগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেসব নাটক ও যাত্রাপালা রয়েছে, সেখান থেকে বাছাই করা বা নতুন করে কিছু নাটক বা যাত্রা মঞ্চায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। সংগীত বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংগীত-উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। যদিও বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই দেশাত্মবোধক এবং মুক্তিযুদ্ধের গান, যেগুলোতে বঙ্গবন্ধুর বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলো নিয়ে একাধিক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

তরুণ প্রজন্ম যারা বঙ্গবন্ধুকে ব্লাক আউট করার সময় বেড়ে উঠেছে, তাদের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করার জন্য যা যা করা দরকার, তার সবগুলোই করা হবে। পুরান ঢাকা অর্থাৎ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যে জায়গায় অবস্থিত সেখানে বঙ্গবন্ধু বহুবার পদার্পণ করেছেন। কাজেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত একটি জায়গা। পাড়া মহল্লায় অনেকেই আছেন, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট করে কিংবা তাঁদেরকে নিয়ে এসব আয়োজন হবে বছরব্যাপী। এছাড়াও সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে অভিনবভাবে বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা থাকবে।

জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। আমরা যাদেরকে একেবারে আওয়ামী লীগ ঘরানার বলে থাকি, এদের একটি বক্তব্য আছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে দলের বাইরে নানা মানুষ রয়েছে। তারা হয়তো আওয়ামী লীগ করে না কিংবা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমরা যাই করি না কেন তা প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছাবে। এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। তা হলো বিশ্বাসযোগ্যতা। আমরা যা কিছু উপস্থাপন করব, তার যেন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে। তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ– যে ব্যক্তি বলবেন কিংবা লিখবেন সেবিষয়ে লোকটি বিশেষভাবে অভিজ্ঞ কিনা? এসব কথা বলার যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা? শোনা কথা, নাকি নিজে সোর্স হিসেবে একথা বলার যোগ্যতা রাখেন। কিংবা যে কারণে তিনি এসব কথা বলার যোগ্যতা রাখেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। লোকটি বিশ্বাসযোগ্য লোক হতে হবে। তিনি জীবনে যতকথা বলেছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কিনা? আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে লোকটি বলবেন, তাঁকে মানুষ পছন্দ করেন কিনা? এখন যদি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু আগে বিরোধিতা করেছেন, তাহলে মানুষ প্রশ্ন তুলবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, তাদের এসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। তা না হলে বছরব্যাপী যে প্রচেষ্টা রয়েছে তার পুরোটা ব্যর্থ হবে।

(লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

১৯৪০ সালে কৈশোরে বঙ্গবন্ধু। ফুটবল ছিলো তাঁর প্রিয় খেলা

১১ মার্চ ১৯৪৮, সচিবালয়ের ১নং গেইটে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মাটিতে শুয়ে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু

জগন্নাথে বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ

নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু এক অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন। আন্দোলন সংগ্রামের নামে মানুষের অসহনীয় কষ্ট হোক এটা তিনি কখনই চাননি। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেমন মিশতে পারতেন, তেমনি সবসময় যোগাযোগ রাখতেন দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। আওয়ামী লীগের কর্মীরা অন্যের বিরক্তির কারণ হোক সেটাও তিনি কোনোদিন কামনা করেননি। প্রতিটি স্বদেশি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও সংগ্রামে তিনি প্রথম কাতারে ছিলেন। তাঁর পদচিহ্ন ধরেই বাঙালি জাতি এগিয়ে চলেছে। তাঁর চোখে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তিমির রাত্রির অবসানের প্রতীক্ষা, ব্যাকুল বাঙালি জাতির আকাঙ্ক্ষিত আলোকজ্জ্বল প্রভাতের স্বপ্ন। এক কথায় বাঙালি জাতিই যেন শেখ মুজিব– শেখ মুজিবের অপর নাম বাঙালি জাতি। এমনি করেই তিনি জাতির সত্তায়, অস্তিত্বে একাকার হয়ে আছেন, বিশ্বের অন্য কোনো নেতার পক্ষে যা সম্ভব হয়নি। এখানেই বঙ্গবন্ধু ব্যতিক্রম।

পুরনো ঢাকার সঙ্গে আত্মিক বন্ধন ছিল বঙ্গবন্ধুর। আন্দোলন সংগ্রামে এই পুরানো ঢাকাতেই তাঁর পদচারণা ছিল সবচেয়ে বেশি। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে তিনি দলকে সুসংগঠিত করেছেন। তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ তথা আজকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও ছিল বঙ্গবন্ধুর এক নিবিড় সম্পর্ক। ১৯৬৫ সালের কথা, তখন জগন্নাথে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহাদাত আলী গেন্ডারিয়ার ৯ নং দীননাথ সেন রোডে থাকতেন। সময় রাত ৯টা, সবেমাত্র তিনি ক্লাস শেষ করে বাসায় ফিরেছেন। এমন সময় প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান সাহেবের গাড়ি ড. শাহাদাতের বাড়ির দরজায় এসে ভিড়লো এবং জানানো হল কলেজের জরুরি কাজে তাঁকে তলব করা হয়েছে। কলেজে এসে প্রিন্সিপাল সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বসে থাকতে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহাদাত আলী, বঙ্গবন্ধু শাহাদাত আলী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "জহুর আহমেদ আপনার ও ছাত্রদের সাথে চট্টগ্রামে অশোভন আচরণ করেছে, এই ঘটনার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।" ঘটনার খেশারত হিসেবে শাহাদাত আলী সাহেবকে ৫০০ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, "টাকাটা আমার নয়, জহুর আহমেদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।" ঘটনাটা ঘটেছিল চট্টগ্রামস্থ আজকের পর্যটন করপোরেশনের হোটেল সৈকতে। একদল ছাত্র নিয়ে শাহাদাত সাহেব এবং অধ্যাপক ওয়াকেফ হোসেন চৌধুরী শিক্ষা সফরে যান। চট্টগ্রামে তাঁরা অবস্থান করেছিলেন ওই হোটেলে। জনৈক ছাত্র হোটেলের এক বেয়ারার সাথে ঝগড়া বাঁধায়, এক পর্যায়ে সে বেয়ারাকে চপেটাঘাত করে। এমতাবস্থায় শাহাদাত সাহেব ও ওয়াকেফ হোসেন হোটেল ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় বেয়ারাকে একশত টাকা দিয়ে মীমাংসা করেন।

ঠিক সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শ্রমিক নেতা মরহুম জহুর আহমেদ চৌধুরী। শিক্ষকদের স্বীকৃত মীমাংসা ভণ্ডুল করে দিয়ে, মারমুখী হয়ে বললেন, "কাউকে ফেরত যেতে দেবো না, কর্ণফুলীর পানি এদের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করা হবে।" অনেক বাক-বিতণ্ডার পর বেয়ারাকে ৫০০ টাকা প্রদান করে ছাত্রের কু-কর্মের মাশুল হিসেবে সে যাত্রায় শিক্ষক-ছাত্র রক্ষা পেয়েছিলেন।

এর বেশ কিছুদিন পর ঢাকার হোটেল ইডেনে চলছে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা। এই সভায় জগন্নাথ কলেজের তদানীন্তন ভিপি রাজু আহমেদ ও অন্যান্য ছাত্রনেতা বঙ্গবন্ধুকে ঘটনাটা জানালেন। এ ঘটনায় খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক সাইদুর রহমানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন চট্টগ্রামের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে। বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব এসেছিলেন কলেজের একজন তরুণ অধ্যাপকের কাছে, তাঁর দলীয় নেতার আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে। এ ধরনের অনুভূতিই বঙ্গবন্ধুকে মহান করেছে। এ ধরনের মহানুভবতা কি এখনকার আর কোনো নেতার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়?

(লেখক : ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

স্মৃতিতে অনুভবে চির অম্লান বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম

স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম বিশ্বে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। আর এই ঘটনার নায়ক হলেন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটকালে আমি ও আমার পরিবারের সৌভাগ্য হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার।

ষাটের দশকে রাজপথের লড়াকু সৈনিক ছিলাম আমরা তিন ভাইবোন আনু, মনু ও সরদার রশীদ। নাম তিনটি নিজ জেলা পটুয়াখালীতে একসাথে উচ্চারিত হতো এলাকাবাসীর মুখে। স্কুলজীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি ভাইয়ের সাথে। আন্দোলন সংগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হই। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ৬-দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিরামহীন সংগ্রাম, মিছিল-মিটিং সভা-সমাবেশ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকার মধ্য দিয়েই কেটে যায় সেই ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন মুখর দিনগুলি। বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে, আমাদের মাতৃভূমি বিপদগ্রস্ত, জনজীবনেও এক অজানা শঙ্কা, সংকট আর অনিশ্চিত গন্তব্যের কথা।

ক্ষমতার রদবদল, আইয়ুবের পতন, ইয়াহিয়ার উত্থান, নির্বাচন ঘোষণা এবং নানা টানাপোড়নের পর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যাজনিত কারণে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১, আমার নিজ জেলা পটুয়াখালীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় এক ঐতিহাসিক এবং তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটে বঙ্গবন্ধুর বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন এবং নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য পটুয়াখালীতে আগমনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পটুয়াখালীতে আসেন, তখন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন কাশেম উকিল। তিনি আমাদের দু'বোনকে দায়িত্ব দেন বঙ্গবন্ধুকে মালা দিয়ে বরণ করার। বঙ্গবন্ধুর আগমনের পূর্বরাতে আজও মনে আছে লাল, সবুজ ও সাদা কাগজ দিয়ে মালা গেঁথে প্রস্তুত হলাম বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানানোর লক্ষ্যে। ভোরবেলা লঞ্চ ঘাটে পৌছালাম এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য। দেখতে পেলাম লঞ্চ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছে। অপেক্ষা না করে আমরা দু'বোন ডিঙি নৌকায় চড়ে নদী থেকে লঞ্চে উঠে বঙ্গবন্ধুকে মালা পরিয়ে দিলাম। আমার জীবনে এটি এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এক অদ্ভুত শিহরণ, জীবনের পরম আনন্দঘন মুহূর্ত। অনুভব করলাম এক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর মধ্যদিয়ে। কিন্তু তখনও ভাবিনি এর চেয়েও পরম মুহূর্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।লঞ্চ ঘাটের সন্নিকটে পাঞ্জাব হোটেলের পাশেই ছিল আওয়ামী লীগ অফিস। কার্যালয়ে চলছিল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সভা। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু সভা চলাকালে আমার বড় ভাই ছাত্রনেতা সরদার আবদুর রশীদ বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ কর্মী, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে খুঁজতে লাগলেন, সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু নাম না বলায় কেউ-ই বুঝতে পারছিলেন না, কাকে খুঁজছেন। কিছুক্ষণ পর জানতে পারলেন সে আইয়ুব খানের মার্শাল 'ল' কোর্টে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে অন্তরীণ। এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন, এক পর্যায়ে বললেন, ওদের বাসা কোথায়? কে কে আছেন? যেই কথা সেই কাজ। বঙ্গবন্ধু সরাসরি পায়ে হেঁটে নতুন বাজার আমাদের বাসা 'সরদার ভিলা'য় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীসহ চলে আসেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য যা না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বৈঠক খানায় বঙ্গবন্ধু বসলেন।

'মা'-এর সাথে কথা বললেন, সান্ত্বনা দিলেন। মা'কে বললেন এখন থেকে আমি আপনার ছেলে। এরপর আমাদের দু'বোনকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, তোমাদের সাহসের কথা, আন্দোলনের কথা, সংগ্রামের কথা আমি শুনেছি, তোমরা ভাল করে পড়াশুনা করে দেশের জন্য কাজ করবে বলে মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি অভিভূত হয়ে শুধু বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে হলো স্বর্গ পেয়েছি, আনন্দে উচ্ছ্বাসে কিশোর মন আন্দোলিত হলো। বঙ্গবন্ধুর স্নেহের পরশ আজও আমাকে শিহরিত করে, সাহস যোগায়, শির উঁচু করে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার শক্তি যোগায়। বঙ্গবন্ধুর সহযোগিতায় আমার ভাই জেল থেকে মুক্তি পায়।

মুজিববর্ষ ও বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ পূর্তিতে মুজিব তোমাকে জানাই হাজারো সালাম আর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অভিবাদন। তুমি বেঁচে থাকো আমাদের মাঝে আদর্শ হয়ে, পথপ্রদর্শক হয়ে, অন্যায়ে প্রতিবাদ হয়ে, শোষিত বঞ্চিতের ত্রাণকর্তা হয়ে, সারাবিশ্বের বন্ধু হয়ে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আমি মুক্তিযুদ্ধে যাই। বঙ্গবন্ধুর জন্য আমি যুদ্ধ করেছি। আমার মা জেলে অন্তরীণ ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে। ভালোবাসি অনুসরণ করি আদর্শরূপে বঙ্গবন্ধুকে। স্বপ্ন দেখি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়নে। লালন করি, ধারণ করি, বাস্তবায়নের কাজ করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে। বঙ্গবন্ধুর জন্যই পেয়েছি আমরা বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

(লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও সাবেক সদস্য
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন)

১৯৫১ সালে কারাগারে রাজবন্দি বঙ্গবন্ধু

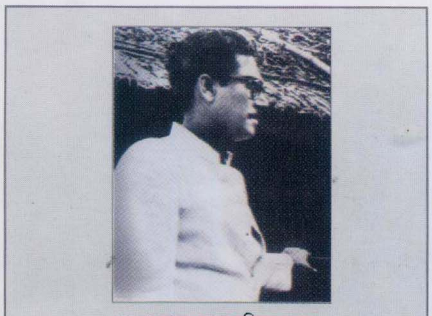

১৯৫৪ সালে তোলা ছবিতে বঙ্গবন্ধু

১৯৬২, জেল থেকে মুক্তির পর বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু স্মরণে জগন্নাথ

অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীন

সারাদেশের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে "মুজিব শতবর্ষ"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বাঙালি জাতির বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পিতা; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও তেমনি বাঙালি জাতিকে আবেশিত করে চলেছে। জগন্নাথ নামের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কালের আবর্তে বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এ জাতিকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে আসছে শতাধিক বছর ধরে। একইভাবে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা তিন পর্যায়ে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন– ক) ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) থেকে গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯) ও নির্বাচন (১৯৭০), খ) নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১), গ) স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠন (১৯৭২ থেকে ১৯৭৫)। একথা বললে ভুল হবে না যে, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে এই জগন্নাথ কলেজেরই ছাত্র রফিক শাহাদাৎ বরণ করে বাঙালিকে বীরের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই পৃথিবীকে অবাক করে বঙ্গবন্ধু জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করেন ১৯৭৩ সালে। এই নির্বাচনে তিনি এবং তাঁর দল প্রায় সব আসনে জয়লাভ করায় জগন্নাথ কলেজের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ এবং কলেজ অধ্যক্ষের নেতৃত্বে সমন্বিত শিক্ষকগণ বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন অফিসে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। সে সময় ছাত্রদের আবেদন অনুযায়ী তিনি পরিত্যক্ত হিসেবে "ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" ভবনটি জগন্নাথ কলেজকে প্রদান করেন। এই ভবনের স্থানেই তৈরি হয়েছে বর্তমানের ১৩তলা একাডেমিক ভবনটি। জগন্নাথ কলেজে এই ভবনটিকে অধ্যক্ষের বাস ভবন এবং লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করা হত। তিনি তখন বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনটিও জগন্নাথ কলেজকে প্রদান করার আশ্বাস দেন যা অদ্যাবধি কার্যকর হয় নি। এ সময় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই জগন্নাথ কলেজে সম্মান কোর্স চালু হয়।

অধ্যক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষকরা বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার পর মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক দেওয়ান ইউনুস আলী বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত গান পরিবেশন করেন। এতে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত খুশী হন এবং স্বাধীন দেশে উচ্চ শিক্ষা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষকদের আহ্বান জানান। তরুণ শিক্ষক দেওয়ান ইউনুস আলীর রচিত সেই গানটি পরবর্তীতে বাংলাদেশ বেতারেও প্রচারিত হয়। গানটি এরূপ– "স্বাধীন বাংলার নাও ভাসাইয়া/ চলছে মুজিব নাইয়া,/ তোরা দেইখা যারে বিশ্ববাসী/ দেইখা যারে চাইয়া/ চলছে মুজিব নাইয়া।... "

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই রয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের বধ্যভূমি। বর্তমান বিজ্ঞান ভবনের মাঠেই এর অবস্থান রয়েছে। এই বধ্যভূমির কথা আজকাল কেউ বলে না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের এ বিষয়ে গবেষণা চালাতে অনুরোধ রইল।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গঠনের মহান ব্রত নিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষের দলগুলোকে একত্রে "বাকশাল" নামে একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি করেন। এই বাকশালের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য জগন্নাথ কলেজের শিক্ষকগণ বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে তাঁর অফিসে গিয়েছিলেন।

১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ কলেজ তার শতবর্ষ পালন করেছিল ১৯৯২ সালে। এ সময় প্রশাসন থেকে একটি স্মরণিকা পুস্তক প্রকাশ করা হয়। ওই স্মরণিকায় প্রখ্যাত শিক্ষকগণ অনেক রচনা লিখেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, সময়টি বিএনপি'র শাসন আমল হওয়ায় শিক্ষকদের লেখায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তেমন কিছুই উল্লেখ নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর অবদান রেখেছিল তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ। তবে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সাথে জগন্নাথের সম্পর্ককে তেমনভাবে প্রকাশ করা হয় নি। এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

(লেখক : সাবেক ডিন, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

নারায়ণগঞ্জে ৮ মে ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন। এর পরপরই গ্রেফতার হন তিনি

পুরানো ঢাকায় বঙ্গবন্ধু

ড. মিল্টন বিশ্বাস

মোগলটুলি, সদরঘাট, জগন্নাথ কিংবা আরমানিটোলার মাঠের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বিশেষত আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সপরিবারে পুরানো ঢাকায় বসবাসের ইতিবৃত্ত তাঁর জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমরা স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। অনলাইনভিত্তিক তথ্য এবং স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ বা নিবন্ধ অবলম্বনে এই অংশটি উপস্থাপিত হলো।

আওয়ামী লীগের জন্মসূত্রের সঙ্গে আদি ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলিস্থ পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবিরের উদ্যোগের সম্পর্ক ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুনের সম্মেলনের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন শওকত আলী। তাঁর উদ্যোগে ১৫০ নং মোগলটুলিস্থ বাসভবনে এবং কর্মী শিবির অফিসকে ঘিরে বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতিমূলক তৎপরতার পর ২৩ জুনের কর্মী সম্মেলনে দলের ঘোষণা দেয়া হয়। শওকত আলীর অনুরোধে কলকাতা থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি মামলা পরিচালনার কাজে ঢাকায় এলে তিনি শওকত আলীকে মুসলিম লীগ ছেড়ে ভিন্ন একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। শওকত আলী এ পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবিরের নেতৃবৃন্দকে নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। এসময় কর্মী শিবিরের প্রধান নেতা ছিলেন শামসুল হক। কামরুদ্দীন আহমদ, মো. তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, আবদুল আউয়াল, মুহম্মদ আলমাস, শামসুজ্জোহা প্রমুখ প্রথম দিকে এবং পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্মী শিবির কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। মুসলিম লীগের আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের অন্যায় কাজগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার লক্ষ্যেই এখানে কর্মী শিবির গড়ে তুলেছিলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৪৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকা এলে তার সঙ্গে শওকত আলীর আলোচনা হয়। শওকত আলী মওলানাকে পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবিরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক তৎপরতার কথা জানান। এসময় মওলানা ভাসানী আলী আমজাদ খানের বাসায় অবস্থান করছিলেন। শওকত আলীর সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক আলোচনা সেখানেই হয়। এই আলোচনার সূত্র ধরে নতুন দল গঠনের জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন শওকত আলী।

সেজন্যে ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মওলানা ভাসানী সেই বৈঠকে যোগদান করেন। এসময় খোন্দকার আবদুল হামিদের সঙ্গে পরামর্শ করে শওকত আলীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, ইয়ার মুহম্মদ খানকে সম্পাদক এবং খন্দকার মুশতাক আহমদকে দপ্তর সম্পাদক করে অন্যদেরসহ একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

উপরি-উক্ত সাংগঠনিক কমিটি ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন রোজ গার্ডেনে নতুন দল গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এক সম্মেলন আহ্বান করে। রোজ গার্ডেনে ২৩ জুনের বিকেল ৩টায় সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। ২৪ জুন বিকেলে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে প্রকাশ্যে জনসভা করে। সভায় আনুমানিক প্রায় চার হাজার লোক উপস্থিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকালে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থাকলেও ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। পরের বছর ঢাকার 'মুকুল' প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে তাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন শেখ মুজিব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন– '১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে প্রথমে উঠব ঠিক করলাম। শওকত মিয়া মোগলটুলি অফিসের দেখাশোনা করে। মুসলিম লীগের পুরনো কর্মী। আমার বন্ধুও। শামসুল হক সাহেব ও শওকত সাহেব আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। শওকত আমাকে নিয়ে কি যে করবে ভেবেই পায় না। তার একটা আলাদা রুম ছিল। আমাকে তার রুমেই জায়গা দিল। আমি তাকে শওকত ভাই বলতাম।' ১৫০ নং মোগলটুলির কর্মীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কার্যক্রম এখান থেকেই পরিচালিত হত। ১৫০ মোগলটুলির মূল তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শওকত আলী। এ প্রসঙ্গে বাহাউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন– 'সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ১৫০ মোগলটুলি বিরোধী রাজনীতির সূতিকাগার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কলকাতা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, জহিরউদ্দিন, নাঈমুদ্দীনের মতো নেতারা প্রথমে ১৫০ মোগলটুলি পার্টি হাউসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে সার্বক্ষণিক বসবাসকারী পার্টি কর্মীদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সব ব্যবস্থাই তিনি করতেন।'

আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর 'স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি' কলামে বঙ্গবন্ধু ও পুরানো ঢাকার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে– 'অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় আগের একটি স্মৃতিচিত্র এঁকে আজকের লেখাটি শুরু করছি। ১৯৫০ সালের কথা। মুসলিম লীগ-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র তখন পুরনো ঢাকার ১৫০ নম্বর ওল্ড মোগলটুলির একটি অফিস। শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছাত্রলীগের নেতা। মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে তখন ছাত্রদের নেতৃত্বে আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। মোগলটুলি তার প্রাণকেন্দ্র। শেখ মুজিবের দুই ঘনিষ্ঠ সহচর এমএ ওয়াদুদ আর এমএ আউয়াল তখন এই মোগলটুলির অফিসে রাত্রিবাসও করেন।

একদিন সকালে এমএ ওয়াদুদ (তিনি তখন সকলের কাছে ওয়াদুদ ভাই) তাঁর সহকর্মী আউয়ালকে জানালেন, আজ বরিশাল থেকে মানিক ভাই আসবেন। এই মানিক ভাই মানুষটি কে আউয়াল সাহেবকে তা জানানো হলো। তাঁর পুরো নাম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী।...কলকাতায় মানিক মিয়া দৈনিক ইত্তেহাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতায় দৈনিক ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানিক মিয়া ভাণ্ডারিয়ায় চলে গিয়ে কিছুকাল বেকার অবস্থায় কাটান। কিন্তু যোগাযোগ ছিল সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের যুবনেতা শেখ মুজিব ও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহচর এমএ ওয়াদুদ ও এমএ আউয়ালের সঙ্গে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে কয়েকজন অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। মানিক মিয়া এই চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন এবং ঢাকায় আসার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু কোথায় থাকবেন? শেখ মুজিবকে সে কথা জানাতেই তিনি ওল্ড মোগলটুলিতে মানিক মিয়ার থাকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। ওয়াদুদ ভাই তাঁর থাকার খাটটি মানিক মিয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে মাটিতে শোয়ার ব্যবস্থা করেন।

তখন সরকারবিরোধী আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল মোগলটুলি। ওয়াদুদ ভাই আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী। গায়ে খাকি শার্ট, পরনে খাকি প্যান্ট, মাথায় ফৌজি টুপি। হাতে টিনের চোঙা। রিকশায় বসে সেই চোঙা ফুঁকিয়ে সারা শহরে আন্দোলনের ডাক দিয়ে বেড়াতেন। মানিক মিয়াকে তিনি সাদরে ওল্ড মোগলটুলিতে এনে ওঠালেন।'

রোজ গার্ডেন, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু : রাজধানী ঢাকা শহরের টিকাটুলি এলাকায় অবস্থিত একটি অন্যতম ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। এ প্রাচীন ভবনটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। ব্রিটিশ আমলের ধনী ব্যবসায়ী ঋষিকেশ দাস ১৯৩১ সালে পুরান ঢাকার বর্তমান ঋষিকেশ দাস রোডে একটি বাগানবাড়ি তৈরি করেন। বাগানে প্রচুর গোলাপ গাছ থাকায় এর নাম হয় রোজ গার্ডেন। ঋষিকেশ দাস আর্থিকভাবে দেউলিয়ার কারণে ১৯৩৭ সালে রোজ গার্ডেন প্যালেসটি খান বাহাদুর আবদুর রশীদের কাছে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হন। প্রাসাদটির নতুন নামকরণ হয় 'রশীদ মঞ্জিল'। মৌলভী কাজী আবদুর রশীদ মারা যান ১৯৪৪ সালে, তার মৃত্যুর পর রোজ গার্ডেনের মালিকানা পান তার বড় ছেলে কাজী মোহাম্মদ বশীর (হুমায়ূন সাহেব)। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার ২২ বিঘা জমির উপর স্থাপিত ভবনটি ৩৩১ কোটি ৭০ লাখ দুই হাজার ৯০০ টাকা মূল্যে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ আদি ঢাকার এ ভবনেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন এই বাড়িতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (বর্তমান আওয়ামী লীগ) গঠনের পরিকল্পনা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম এর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন

ঢাকার টিকাটুলীর কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্রাসাদে "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে ১৯৫৫ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং নাম রাখা হয় "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।" আগেই বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠাকালীন এই সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। তখন তিনি কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন।

পুরানো ঢাকা ও শেখ হাসিনা : বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম ঢাকায় আসেন পিতা (শেখ মুজিবুর রহমান) প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (এমপিএ) হবার পর, ১৯৫৪ সালে। থাকা শুরু হয় পুরানো ঢাকার মোগলটুলির রজনী বোস লেনের বাসায়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হবার পর ৩ নম্বর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে থাকতে শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে শেখ হাসিনা ভর্তি হন টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটির দ্বার উদঘাটন হয়।

আন্দোলন-সংগ্রামে জগন্নাথের শিক্ষক-শিক্ষার্থী : ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের বীজ মূলত জগন্নাথ ও ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস থেকেই বপন করা হয়। ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলনের নেতা হায়দার আকবর খান লিখেছেন– "যতদূর মনে পড়ে জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রথমে ছাত্র সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে কলেজ থেকেই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা এই আন্দোলনটি আঁকড়ে ধরেন।" তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ছয় দফা আন্দোলনেও জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষিত হলে তার সমর্থনে সফল হরতাল পালনে ভূমিকা পালন করে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুজিব বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কাজী আরেফ আহমেদ ও চিত্র নায়ক ফারুক।

১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হলে জগন্নাথ ছাত্র সংসদের উদ্যোগেই প্রথম প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন- "I am at the disposal of the students of Jagannath College." ১১ দফার অন্যতম দাবি ছিল তৎকালীন জগন্নাথ কলেজসহ সকল প্রাদেশীকীকরণ কলেজসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিরোধিতায় কলেজটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সরকার বাধ্য হয়।

পুরানো ঢাকা ও জগন্নাথের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে শামসুজ্জামান খান 'স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু' প্রবন্ধে লিখেছেন– '১৯৫৬ সালে শেখ সাহেবকে দেখি একটি রাজনৈতিক মিছিলে সংগ্রামে। তখন তিনি জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। আওয়ামী লীগের চুম্বক শক্তি অধিকারী সংগঠক। সাবেক মন্ত্রী। দিনটি ঠিক মনে নেই। সেদিন শেখ সাহেবের নেতৃত্বে একটি ভুখা মিছিল বের হয়। মিছিলটি সদরঘাট থেকে চকবাজার যাচ্ছিল। জোরালো মিছিল। শেখ সাহেব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তারপর মিছিল শুরু। মিছিল কিছুদূর যাবার পর বুড়িগঙ্গা নদীর ওপার থেকে বৈঠা ও লাঠি হাতে কিছু লোক মিছিলে যোগ দেয়। তাতে মিছিলটি আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে।

আমরা তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, ছাত্রলীগ করি। যোগ দিয়েছি সেই মিছিলে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা তখন ক্রীড়া ও রাজনীতি চর্চার জন্য বিখ্যাত। অতএব বিপুলসংখ্যক ছাত্র সেই মিছিলে সামিল হয়েছে। মিছিল এগিয়ে চলেছে। আবেগ ও উত্তেজনা তুঙ্গে। পুলিশ বাধা দিল। শেখ সাহেব তাদের সঙ্গে তর্ক করলেন এবং মিছিল নিয়ে সামনে বাড়লেন। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি চালায় মিছিলকারীদের ওপরে। গুলিতে আহত হয় জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ইকবাল। আহত ইকবালকে মিটফোর্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেখ সাহেব তাকে দেখতে যান, ডাক্তারদের ভালোভাবে চিকিৎসা দিতে অনুরোধ করেন। ইকবালকে অক্সিজেন দেয়া হয়। তাকে দেখে অনেক ছাত্র ও জনতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমিও ভীষণভাবে বেদনাবিদ্ধ হই।

শেখ সাহেবকে এর পরে দেখি ওই ১৯৫৬ সালেই। তিনি তখন পূর্ব বাংলার শিল্প, শ্রম ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রী। তখন আওয়ামী লীগ অফিস ছিল সদরঘাটে– রূপমহল সিনেমার বিপরীত দিকে একটু ভেতরে একটা পুরনো বিশাল হলুদ বাড়িতে। রাস্তাটার নাম ছিল সিমসন রোড। অফিসে তখন লোকজন গমগম করত। মন্ত্রী ও নেতারা আসতেন। আমরাও মাঝে-মধ্যে যেতাম কৌতূহল আর ঔৎসুক্য নিয়ে।

মন্ত্রী হবার পর শেখ সাহেব যেদিন প্রথম অফিসে আসেন সেদিন আমি সদরঘাটের লাগোয়া মল্লিক ব্রাদার্সের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শেখ সাহেব মন্ত্রীর গাড়িতে এসে ওইখানেই নামেন। রাস্তায় হকারদের দোকানপাট ছিল। শেখ সাহেব আসায় বেশ একটা ভিড় হয়ে গেল। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন এবং হেঁটে এগুতে থাকলেন। পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করে তাঁর জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করছিল। তিনি হাত উঁচু করে বললেন, 'তোমরা সরো, আমার নিরাপত্তার দরকার হয় না।' তিনি হেঁটে অফিসের দিকে চললেন– অনেক লোক তাঁর সঙ্গে গেল। সেদিন তিনি ধবধবে সাদা শেরওয়ানি পরেছিলেন। দীর্ঘকায়, ছিপছিপে সুন্দর মানুষটিকে বড় আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল নেতা এমন না হলে মানায় না।

১৯৬৩ সালে শেখ সাহেবকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটে। আমরা ওই বছরে কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার উদ্যোগে ঢাকাস্থ প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এক শিশু-কিশোর আনন্দমেলার আয়োজন করি। সেই মেলায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি আগ্রহসহকারে আসেন এবং মেলার প্রদর্শনী ও স্টল পরিদর্শন করেন। আনন্দমেলার নিরাপত্তাসহ অন্যান্য বিষয় দেখাশোনার জন্য কচি-কাঁচার মেলার সদস্যরা নিয়োজিত ছিল। শেখ সাহেব যখন প্রদর্শনী দেখছিলেন তখন তাঁর কাছ থেকে মেলার গোয়েন্দা বাহিনি একটি লোককে আটক করে। তার চেহারা উসকো-খুশকো, গায়ে একটি কাঁথা জড়ানো। ক্ষুদে গোয়েন্দারা তার দেহ তল্লাশি করে তার কাছে মেলার একটি ম্যাপ ও কিছু কাগজপত্র পায় এবং পরে দেখা যায় ক্ষুদে গোয়েন্দারা যাকে পাকড়াও করেছে সে সরকারের আসল গোয়েন্দা। শেখ সাহেবের পিছু নিয়ে আনন্দমেলায় ঢুকেছে। শেখ সাহেব সরকারি গোয়েন্দাকে কাছে ডেকে বললেন, 'চান্দু, এখানেও আমার পিছু নিয়েছ– শিশুদের সঙ্গে একটু আনন্দ করবো তাতেও ফেউ লাগিয়ে রেখেছে সরকার। যা মাফ করে দিলাম।' পরে দাদাভাইয়ের দিকে ঘুরে বললেন, দাদাভাই, আপনার গোয়েন্দারা সরকারি গোয়েন্দাদের উপর টেক্কা দিয়েছে, সাবাস!...

এর পরের ঘটনা ১৯৬৭ সালের। ছয় দফার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। আমি তখন জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করি। তো, একদিন অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান সাহেব ডেকে বললেন, শামসুজ্জামান, তুমি আর রাহাত খান (তিনিও তখন ওখানে অধ্যাপক) আজ সন্ধ্যায় আমার একটা বিশেষ ডিউটি করবে। একজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে আমরা আজ কলেজের 'অবকাশ' রেস্তোরাঁয় ডিনার খাবো। আমি আর অজিত বাবু (অধ্যাপক অজিতগুহ) থাকবো। আরো দু-একজন থাকবেন। অতিথির নাম বলবো না– বুঝে নিতে চেষ্টা করো। কাউকে বলার দরকার নেই। শুধু পূর্বদিকের গেটে পাহারা দেবে। অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দিবা না। রাত আটটায় তিনি আসবেন। তখন তোমরাও সামনে থাকবা না। একটু পরে আসবে। ছুটির দিন আছে, অন্য কেউ থাকবে না।

পরে জানতে পারি যে, ওই রাতে শেখ সাহেবই ছিলেন বিশেষ অতিথি। তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন বোধহয় জনাব এম ইউ আহমদ নামে খুলনার এক ব্যবসায়ী। ওখানে ছয় দফা এবং রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুদিন পরে অধ্যক্ষ সাহেব কলেজে এক বড় আকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলেন। এবং এও বলেন, জাহেদুর রহিম, অজিত রায়কেও ওই অনুষ্ঠানে ডাকতে হবে। তবে তাঁরা যে আসবেন এ তথ্য গোপন থাকবে। সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রয়াত শিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তী। তিনি "ডিম পাড়ে হাঁসে/খায় বাঘডাসে..." গানটি গান। আবদুল লতিফ, সৈয়দ আবদুল হাদি, সাবিনা ইয়াসমিন, ফ্লোরা আহমেদ ওই অনুষ্ঠানে গান করেন। রবীন্দ্রসংগীত গান জাহেদুর রহিম, অজিত রায়, মোরাদ আলী, ফ্লোরা আহমেদ প্রমুখ। প্রায় দশ হাজার লোকের সেই জমাট অনুষ্ঠানে সরকারি নির্দেশ ভঙ্গ করে

রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করা হয়। এইভাবে জগন্নাথ কলেজ থেকেই বাঁধ ভেঙে দেয়া হয়। পরে শুনেছি শেখ সাহেবের ওই দিনের ডিনারের উদ্দেশ্যই ছিল এই রবীন্দ্রসংগীতের নিষিদ্ধ দেয়াল ভেঙে দেয়া। তাঁর নির্দেশেই ওই বিশাল অনুষ্ঠান।

এর জন্য অবশ্য পরে অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ এবং আমাদের মূল্য দিতে হয়েছে। অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানকে মোনেম খাঁ বদলি করেন। অজিত বাবুকে কলেজ ছাড়তে হয়। আমি চলে যাই ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাহাত খান ইত্তেফাকে যোগ দেন।

বঙ্গবন্ধুর এমন নানান স্মৃতি আমার মনে চির-সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।'

২০২০ সালে প্রকাশিত সিক্রেট ডক্যুমেন্টস চতুর্থ খণ্ডের সূত্রানুযায়ী একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর যে জগন্নাথে পদচারণা ছিল তা স্পষ্ট। গোয়েন্দা রিপোর্টটি ১৯৫৩ সালের– A Secret Source reported on 25.6.53 that the proposed Dacca District Peace Convention will be held on 26.6.53 at Jagannath College Hall. Sk. Mujibur Rahaman and others (mentioned) may attend the Convention. (Secret Documents, vol 4, 1954-1957, page 93)

মূলত বঙ্গবন্ধু'র গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, তাঁর অতি সাধারণ জীবন-যাপন তাঁকে পুরানো ঢাকার মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। অর্থাৎ তিনি যদিও আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বস্তরের মানুষের মাঝে। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তির প্রয়োজন ছিল না যদিও তাঁকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে নানান রহস্যময় ঘটনার প্রসঙ্গ। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শতাব্দী লালিত মূঢ়তা দূর করার জন্য বাঙালিকে মুক্তির মন্ত্র শোনান, সাধারণ মানুষকে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করা ও ভালোবাসায় সকলকে কাছে টানা ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশিষ্টতা। জন্মশতবর্ষে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

(লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮, জামিনে মুক্ত বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা জেলগেট থেকে গ্রেফতার দেখিয়ে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়

জানুয়ারি ১৯৬৯, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ট্রাইবুনালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় জান্তা সরকার

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হলে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এ বঙ্গমাতার সাথে বঙ্গবন্ধু

২৬ মার্চ ১৯৭১, রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে আটক করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়

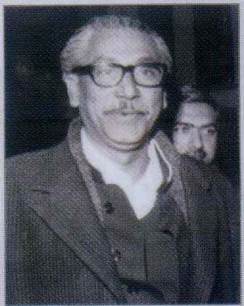

পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তির পর লন্ডনে বঙ্গবন্ধু

ফোন: ৯৫৩৪২৫৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪৭১১৮৪৪৯, www.jnu.ac.bd
প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়